ঢাকা শহর আমাকে সুখী করে তোলে। আলোড়িত করে তোলে। আমি সুখী বোধ করি। আমি হাঁটতে পছন্দ করি এই শহরে। তবে দিনের বেলায় নয়, ফাঁকা ঢাকায় গভীর রাতে।
ঢাকার এই নিস্তব্ধ রূপ আমি দেখেছি। যখন শ্যালে, সাকুরা কিংবা রমনার পাশ ধরে শাহবাগের দিকে হাঁটতে থাকি, আমি তীব্র অনুভূতিতে কেঁপে উঠি। বিকট শব্দ করে একেকটা ট্রাকের বহর আমাকে অতিক্রম করে যায়, আমাকে পেছনে ফেলে যায়; আমার তখন মনে হয়, আমি যেন রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। একেকটা ট্রাক রেলের একেকটা বগি। জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য কাপে (ওয়ানটাইম) চা খেতে খেতে আমি জীবনের প্রথম রেলগাড়ি দেখার মতো সুখ পাই।

আমার তখন মনে হয়, আমার নবজন্ম হয়েছে। একটা কাপ আইসক্রিম খেতে খেতে হাঁটতে থাকি চারুকলার দিকে। চারুকলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ভেতরের গভীর পুকুরটার পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয় পেয়ে আমি চারুকলার ভেতর রাতের বেলায় ঢুকি না। কারণ, এ নিস্তব্ধতাকে তখন আমার আরও ১৬-১৭ বছর আগের নিস্তব্ধতা মনে হয়। চোখে ভাসতে থাকে, আমাদের গ্রামে তখনো বিজলি বাতি আসেনি। উঠানে পূর্ণিমার চাঁদের সামনে চট পেতে বসে আছে সবাই, আমি দৌড়াদৌড়ি করছি। একটু দূরে জোনাকি পোকা তার আলোর নাচন দেখাচ্ছে। কয়েকটা বাদুড় চাঁদকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে চলে যাচ্ছে। আমার শখ ছিল একটা জোনাকি পোকা ধরার, কিন্তু গল্পের আসর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যেতে ভয় পেতাম। রাতের চারুকলার সামনে দাঁড়ালে ছোট্টবেলার সেই অনুভূতি খুঁজে পেতাম।

সোহরাওয়ার্দীকে হাতের বামে রেখে হাঁটতে থাকি, টিএসসি পেছনে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগোতে থাকি। ঘোর আমাকে পেয়ে বসে। আমি হাঁটতে থাকি নীরবে, ভিসির বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ফুলার রোডটার দিকে একটু তাকাই। হ্যাঁ, একটু সামনেই ড. হুমায়ুন আজাদ থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি কত ইতিহাসের, রক্তের, আন্দোলনের, কিংবদন্তিতুল্য শিক্ষক-ছাত্রের সাক্ষী সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে যেন, ‌‘এসো, ছুঁয়ে যাও আমাকে।’

ভুলক্রমে একটা কাক ডেকে ওঠে। মনে মনে খুঁজি, ঢাকায় কাক ছাড়া আর কী কী পাখি আছে এখন? খুব একটা চোখে পড়ে না। নটর ডেম কলেজে দেখেছি, বিকেলে শত শত চড়ুই-শালিক জড়ো হয় এসে। সম্ভবত মতিঝিলের সব পাখি এসে জমা হয়।

কারণ, এটাই সম্ভবত মতিঝিলের একমাত্র সবুজ এলাকা। এখানে কিছু বেজিকে দেখেছি অবাধ ঘুরতে। আমি ঢাকায় এমন মুক্তভাবে বেজি ঘুরতে কোথাও দেখিনি।
একটু একটু করে আমি শেষ রাতে বাসার দিকে হাঁটতে থাকি। বলাকার পাশ দিয়ে সোজা সোনারগাঁও রোডে চলে যাই। সব নিস্তব্ধ। মসজিদের মাইকে আজান শুরু হয়।

তখন চোখ বন্ধ করে ফেলি আমি। যেন চোখে আমার পাথরের ঢাকা না ভাসে। আমার চোখে তখন ভাসে আমার গ্রামের বাড়ি। ঘড়ি চিনতাম না। আজানই আমার ঘড়ি ছিল। অপেক্ষা করতাম, কখন ভোরের আজান পড়বে। আর আমি সকালে হরিতকী কুড়াতে বের হব। কিংবা শিশিরভেজা সকালে শর্ষে ফুল আনতে বের হব। যখন রাস্তায় চোখ খুলি, নিজের অজান্তে বুকটা ফাঁকা হয়ে যায়। তবুও এখানে আমার শৈশবকেই খুঁজি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে থাকি, ছুটতে থাকি একটু বিশুদ্ধ শিশির ছুঁতে। চোখে ভাসে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢাকার বর্ণনা, যা কর্নেল ডেভিডসন দিয়েছেন। সালতি, কাঠের পিলার সারি সারি নদীর ঘাটে। শুনতে পাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ, দেখতে পাই রথের চাকা, যদিও আমি কখনো এসব দেখিনি ঢাকায়। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয়, পরিচিত কত কত স্মৃতি এই সব পথে ছড়িয়ে রয়েছে। আমার কেন জানি মনে হয়, আমি এই ঢাকায় আগে জন্মেছিলাম। স্মৃতির টানে আবার ফিরে এসেছি।

আমার ঢাকা! আমার অসুখের নাম ঢাকা! আমার আরোগ্যের নামও ঢাকা! স্মৃতির শহর আমার ঢাকা! ভালোবাসার ঢাকা!